Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 244 - 253
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার পথে স্বতন্ত্র নাবিক সুবিমল মিশ্র : ভাবে ও ভাষায় (নির্বাচিত নভেলেট অবলম্বনে)

রিন্টু বাঙ্গাল
গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা
Email ID : rintubangal929@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Anti-establishment, Little Magazine, Stylistics, Politics, Sexuality, Sexual-violence, Protest, coordination skills.

Abstract
Subimal Mishra (June 20, 1943-February 8, 2023) whose name comes first in the list of anti-establishment literary practices. He was proficient in everything from literature, science, philosophy, mythology to history, his ability to coordinate in his writing is proof of this. Subimal Mishra wrote a critique of his own writing. His favorite author was Kamalkumar Mazumder. He was directly influenced by the aggressive language of Kamalkumar Majumder. According to him, the one who can attack the language keeps the language alive. His last advice was 'don't surrender'. He never surrendered himself. From the beginning to the end of his literary career, he wrote only in Little Magazine. Despite repeated invitations, he did not work with any established magazine or publishing house. He did not bow down to any powerful institution. Therefore, in the era of advertising, he did not get much recognition among the readers. He himself was the author, publisher, printer, shipper and bookseller of his books. He has done at least five-six papers in his whole life. Despite his immense love and devotion, he could not save a single one. Subimal Mishra's seventh and last magazine was his own—'Patalgaddi', each issue of which was the last issue. The 'Pathak Samabaya' was developed completely experimentally. He called his writings non-stories, anti-stories or anti-novels in the case of novels. His main point is that a piece of writing is not just a text, nor is a book just a reading object—it is a whole art. The main themes of his writings are sexuality and politics. His protest against sexual violence. Therefore, even in the protest, the terrible image of sexual violence has emerged. Some say he composed pornography. His writing is unreadable due to the use of vulgar words. If you want to understand Subimal Mishra, you have to leave the conservative mentality. As a special approach, the author has chosen a satirical ironic language. Several other important themes can be noted in his writings— scientific consciousness, love of nature, sense of duty of a conscious citizen, foresight about world politics etc. On the whole, his thinking, use of language and style of presentation have made him a star in Bengali literature. In this article, the uniqueness of his writing is realized by

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

reviewing his two novelets or novela 'Tejashkriya Abarjona' (1980) and 'Adyanta Manush' (1992).

Discussion

পেশায় শিক্ষক, নেশায় লেখক– এমন সাহিত্য-সাধক বাংলা সাহিত্য জগতে কম নয়। তাঁরা সকলেই প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে সাহিত্য চর্চায় স্বমহিমায় বিদ্যমান। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য চর্চার তালিকা সীমিত। এই প্রসঙ্গে যাঁর নাম সর্বাগ্রে আসে, তিনি সুবিমল মিশ্র। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ব্যাপারে তিনি দীক্ষাগুরু রূপে স্বীকার করেছেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার বীজ সুপ্ত আকারে হাংরি জেনারেশনদের লেখার মধ্যে নিহিত ছিল। সুবিমলের হাতে সেই ধারা এক অন্য মাত্রা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে সুবিমল মিশ্র কোনোদিনই হাংরি আন্দলনের (১৯৬১-১৯৬৫) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদী ধরন তাঁকে হাংরির লেখক গোষ্ঠীর থেকে পৃথক পরিচিতি দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের আরেক সুবিমল হলেন সুবিমল বসাক। তিনি হাংরি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। সুবিমল বসাক ও সুবিমল মিশ্র ছিলেন ভালো বন্ধু। সাহিত্যের স্থবিরতা ভেঙে ফেলার বিষয়ে তাঁদের মতাদর্শগত মিল থাকলেও বিষয় নির্বাচন, ভাষা প্রয়োগ, রচনা শৈলী বা উপস্থাপন রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। আলোচ্য লেখকের শৈলী প্রয়োগ দক্ষতা তাঁর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার এক সবল হাতিয়ার। তিনি সাহিত্যের সংরূপ নিয়েও নানান পরীক্ষামূলক রচনায় ব্রতী হয়েছেন। এই নিবন্ধে তাঁর দুটি নভেলেট বা নভেলা ‘তেজস্ক্রিয় আবর্জনা’ (১৯৮০) ও ‘আদ্যন্ত মানুষ’ (১৯৯২)-এর পর্যালোচনা করে তাঁর বিষয় ভাবনা, সমাজ চেতনা, ভাষা প্রয়োগ কৌশল প্রভৃতি অনুধাবন করা হল।

কেবল লেখক পরিচিতি দিতে গেলেই শব্দসীমা অতিক্রান্ত হতে পারে। কবির ভাষায় ‘কবিরে পাবে না তার জীবন চরিতে’ তবুও লেখকের লেখার জগতে প্রবেশ করার আগে ব্যক্তি সুবিমল মিশ্রকে এক ঝলক দেখে নেওয়া যেতে পারে। খাতায় কলমে তাঁর জন্ম ১৯৪৩, ২০ জুন। লেখক নিজে তাঁর ‘আত্মজীবনীর খসড়া’য় লিখেছেন–

> “...সার্টিফিকেটে এটা আছে, গোটাটা মিথ্যে, স্কুল থেকে বসিয়ে দেওয়া।”[১]

তাঁর মা বলেন অগ্রহায়ণ মাসের (ডিসেম্বর) কোনো এক বুধবার তাঁর জন্ম। বাবা ছিলেন টুলো পণ্ডিত। অস্বচ্ছল পরিবারে বেড়ে ওঠা। বাংলায় এম. এ। কিন্তু তাঁর জ্ঞানের পরিধি শুধু বাংলা সাহিত্যের মধ্যে সীমায়িত নয়, বিশ্ব সাহিত্যের বড়ো পাঠক সুবিমল মিশ্র। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাণ থেকে ইতিহাস কোন বিষয়েই তিনি পিছিয়ে নন; তাঁর লেখার মধ্যে সমন্বয় সাধন দক্ষতাই তার প্রমাণ। সোনাগাছির লাগোয়া একটি স্কুলে মাস্টারি করতেন। তবে নিজেকে পরিচয় দিতেন ‘আমি লেখক’। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁকে খবরের কাগজে কাজ করতে বারণ করেছিলেন, সেই থেকেই তাঁর অপ্রাতিষ্ঠানিকতার সূত্রপাত। তিনি কতটা প্রতিষ্ঠান বিরোধী তা তাঁর ঘরটাও জানান দিত। একেবারে সাধারণ স্বাভাবিক গৃহসজ্জার বিপরীত। কোনো আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই।

> “বই আছে। শুধু বই। বই শুধু বই-ই। টেবিলে বই, চেয়ারে বই, শোয়ার জায়গায় বই, মেঝেতে ডাঁই করা বই, তাকে বই, ঘরে ঢুকতে গেলে বই ঠেলে ঢুকতে হয়।”[২]

তাঁর লেখার মধ্যেও নানান দেশি বিদেশি লেখকের বইয়ের নাম উল্লেখ রয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও তিনি নিজের কাজ নিজে করতেই পছন্দ করতেন। রুটিনের মধ্যে ছিল ২৪ ঘণ্টায় ৩ ঘণ্টা লেখা, ৫ ঘণ্টা পড়া। দিনে লিখতেন ৭০০ পাতা, ছাপতে দিতেন ৭০ পাতা। সাহসী এবং দুরন্ত চিন্তার ধারক ও বাহক সুবিমল মিশ্র নিজের লেখার সমালোচনা নিজেই লিখেছেন। তাঁর ‘আত্মজীবনীর খসড়া’য় অনেকগুলি ‘প্রিয়’র তালিকা দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় বই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। প্রিয় লেখক কমলকুমার মজুমদার। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন কমলকুমার মজুমদার-এর আক্রমণাত্মক ভাষার দ্বারা, তাঁর মনে হয়েছিল ভাষাকে যে আক্রমণ করতে পারে সেই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখে। প্রিয় সম্পাদক নিজের মতই আজীবন লিটিল ম্যাগাজিনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচা এক মানুষ, সমর সেন। প্রিয় সময় রাত বারোটার পর, রাত জেগে লেখা। উইল হিসাবে লিখে গেছেন–

> "আমার অবর্তমানে আমার আন্ডারগ্রাউন্ড-টি প্রতিষ্ঠান-বিরোধীদের একটা ঠেক হবে, প্রকৃত লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি হবে।"[৩]

এবং শেষ উপদেশ হিসাবে বলেছেন 'সারেন্ডার করো না'। মজার বিষয় লেখক নিজেই বলেছেন—

> "এসব নিয়ে জীবনী একটা বানিয়ে নিন।"[৪]

জীবনীর পাতায় ৮ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ জীবন প্রদীপ নিবে গেলেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে নতুন এক আলোর দিশা দিয়ে গেছেন।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি কেবল লিটিল ম্যাগাজিনেই লেখালিখি করেছেন। বারবার আমন্ত্রণ পেয়েও প্রতিষ্ঠিত কোনো পত্রিকা কিংবা প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে তিনি কাজ করেননি। মাথা নত করেননি কোনো ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠানের কাছে। তাই বিজ্ঞাপনের যুগে পাঠক মহলে তেমন পরিচিতি লাভ করতে পারেননি। তাঁর গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, মালবাহক ও পুস্তক বিক্রেতা তিনি নিজেই। ১৯৬৭ সালের শেষ দিক থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শুধু লিটিল ম্যাগাজিনের জন্যই কাজ করেছেন। পাঠকের রসনা তৃপ্ত করতে গিয়ে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সাহিত্য রচনা তিনি করেননি। তাই বড় কাগজের লেখক তিনি নন। তাঁর মতে বাজার চলতি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলির একমাত্র লক্ষ্য বাণিজ্যিক সাফল্য, মুনাফাই শেষ কথা। শিল্প সেখানে অবহেলিত। তিনি বলেন, -

> "আমার রচনা পণ্যে পরিণত হোক অথবা মধ্যবিত্ত বাবু শ্রেনির পাকস্থলীতে হজমের যোগ্য হোক এ আমি চাই না।"[৫]

লিটল ম্যাগাজিনের মধ্যেও যখন বাজারি রুচির বিজ্ঞাপন এসে ভিড় জমিয়েছে, সেখানেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। করেছেন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতারও বিরোধিতা। লিটিল ম্যাগাজিনকে সন্তানসম লালনপালন করলেও সুবিমল মিশ্রকে কেন্দ্র করে কোনো পত্রিকা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সারাজীবনে অন্তত পাঁচ-ছটি কাগজ তিনি করেছেন। অপরিসীম ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও একটাও বাঁচাতে পারেননি। প্রথম কাগজ 'অন্যরূপ রূপান্তর', দ্বিতীয় 'একজন', তৃতীয় 'অ্যাঙ্কিলোসার', চতুর্থ 'বিজ্ঞাপন'— পরবর্তীতে 'বিজ্ঞাপন পর্ব', পঞ্চম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', ষষ্ঠ 'কবিতীর্থ'। কয়েকটি পত্রিকা ছিল যুগ্ম সম্পাদনা— সেখান থেকে নয় তিনি বিতাড়িত হয়েছেন, নয় পত্রিকা আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে নিজেই সরে এসেছেন। পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করে বিজ্ঞাপন। তাই পত্রিকা চালাতে গেলে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের 'খেমতা' লেখকের ছিল না। নিজের খরচে চালানোর মতোও আর্থিক বল নেই। অগত্যা ইতি টানতে হয়েছে বারংবার। সুবিমল মিশ্রের সপ্তম ও শেষ পত্রিকাটি ছিল নিজস্ব— 'পাতালগাড্ডি', যার প্রতিটি সংখ্যাই শেষ সংখ্যা। পত্রিকা ছাড়াও নতুন লেখকদের নিয়ে তিনি প্রকাশনার কাজও করেছিলেন। একেবারে সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক ভাবে গড়ে তুলেছিলেন 'পাঠক সমবায়'। সমবায় ভিত্তিতে অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করে তাদের নামে উৎসর্গ করে বই প্রকাশের নব উদ্যোগ ছিল প্রশংসনীয়। লেখকদের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কারণে এই সংগঠনটিও ভেঙে যায়। তবুও তিনি কখনো সারেন্ডার করেননি; না সমাজের কটূক্তির কাছে, না অর্থনৈতিক দৈন্যে, না শারীরিক অসুস্থতায়।

তিনি নিজের লেখাগুলিকে বলেছেন অগল্প, না গল্প, অ্যান্টি-গল্প কিংবা উপন্যাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টি-উপন্যাস। প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা করে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখকের সব ধরনের লেখালিখি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই। তবে নির্বাচিত নভেলা দুটির আলোচনায় আসার আগে তাঁর অন্যান্য রচনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দরকার। তাঁর প্রথম ছক ভাঙা গদ্য 'হারাণ মাঝির বিধবা বৌয়ের মড়া বা সোনার গান্ধীমূর্তি' (১৯৬৭) পাঠক মহলে আলাদা করে নজর কেড়েছিল। 'পাঠক সমবায়' থেকে লেখকের প্রচেষ্টায় প্রকাশ পায় 'নাঙা হাড় জেগে উঠেছে'। এই গ্রন্থের অগ্রিম পাঠক হয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'দু-তিনটে উদোমবাচ্চা ছুটোছুটি করছে লেভেল-ক্রসিং বরাবর', 'বাব্বি', 'আর পাইপগান এত গরম হয়ে যায় যে এর ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে', 'এই আমাদের সিকি-লেবু নিংড়ানি', 'নিকট প্রবিষ্ট সম্পর্কেও ধারণক্ষমতা', 'সতীত্ব কি রাখবো, অপর্ণা?', 'বাগানের ঘোরানীম গাছে দেখন

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চাচা থাকতেন', 'উট', 'ছুরি', 'নুয়ে গুয়ে দুই ভাই' প্রভৃতি। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই '৩৬ বছরের রগড়ারগড়ি' গল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে। তাঁর প্রথম অ্যান্টি-উপন্যাস 'আসলে এটি রামায়ণ চামারের গল্প হয়ে উঠতে পারতো' প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর দ্বিতীয় উপন্যাস 'রঙ যখন সতর্কীকরণের চিহ্ন' ১৯৮৪-তে, এবং তৃতীয় উপন্যাস 'কণ্ঠ পালক ওড়া— সবকিছুই বা বাজার-চলতি বাস্তবতা গুলিকে অবিশ্বাসযোগ্য করে তোলার কৌশল' প্রকাশ পায় ১৯৯০-তে। আসলে এই তিনটি একটিই বড়ো উপন্যাসের তিনটি খণ্ড স্বরূপ। তিনে মিলে একটি বৃত্ত দেওয়ার চেষ্টার মতন, একটা অন্যরকম ট্রিলজি। ফর্মের দিক থেকে এবং বিষয় ভাবনায় একই। পাণ্ডুলিপি আকারে প্রকাশিত অ্যান্টি-উপন্যাস 'হাড়মড়মড়ি' ও 'পোঁদের গু তিন জায়গায় লাগে' একেবারে অন্য ধারার রচনা। এখানে অনেক বেশি গ্রাফিক্যাল ও ভিজ্যুয়াল উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে 'সত্য উৎপাদিত হয়', 'ওয়ান পাইস ফাদার মাদার', 'চেটে চুষে চিবিয়ে গিলে'। তিনি দুটি নভেলেট বা নভেলা রচনা করেছেন— 'তেজস্ক্রিয় আবর্জনা' ও 'আদ্যন্ত মানুষ'। তাঁর প্রবন্ধ, চিঠি, মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রভৃতির সংকলন গ্রন্থ 'সান অ্যান্ড মার্ডারার্স' এবং গ্রন্থ সমালোচনা থেকে আত্ম সমালোচনা সমস্ত রকমের আলোচনার সংকলন হল 'সুবিমলের বিরুদ্ধে সুবিমল এবং উস্কানিমূলক অনেককিছুই, আপাতভাবে'। ডায়েরি-প্রবন্ধ-নিবন্ধ-পোস্টার-গল্প-নভেলার এক বিচিত্র কোলাজ, দুই মলাটের মাঝখানে— 'লোহার-তার বাঘ ও দর্শকের মধ্যে রক্ত ভালবাসে'। তাঁর নাটকের সংখ্যা একটি— 'ভাইটো পাঁঠার ইসটু'। তাঁর বেশির ভাগ লেখার বিষয়বস্তু প্রথাগত সমাজ ও চিন্তাধারার বিরোধিতা, মৌলবাদী ধারণার বিপরীতে প্রশ্ন করার সাহস জুগিয়েছে। বাংলা সাহিত্য ধারায় চলে আসা গতানুগতিক কাহিনি গ্রন্থনাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। তাঁর মূল বক্তব্য একটা লেখা কেবল একটা টেক্সট নয়, একটা বইও তেমন শুধুই রিডিং অবজেক্ট নয়— পুরোটাই একটা শিল্প। জ্ঞান, পরিশ্রম ও সৃজনশীল চিন্তার মেলবন্ধনে এক নতুন ফর্ম তৈরি হয়েছে তাঁর লেখায়। তাঁর লেখার মূল উপাদান যৌনতা ও রাজনীতি। তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের মাধ্যম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতো। সেক্স ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ, তাই প্রতিবাদের মধ্যেও উঠে এসেছে সেক্স ভায়োলেন্সেরই ভয়াবহ চিত্র। পেশাদারি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অধঃপতন, সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্ন বিকৃত অবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার এক বিশেষ পন্থা রূপে লেখক বেছে নিয়েছেন সুতীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ভাষা।

সুবিমল মিশ্রের লেখার রেখাচিত্র আঁকতে গিয়ে সমালোচকগণ বিশেষত তাঁর তিনটি অ্যান্টি-উপন্যাস এবং ভিসুয়াল নভেল 'হাড়মড়মড়ি'-র (১৯৯৪) উপর জোর দিয়েছেন। গল্পগুলির আলোচনাও কমবেশি রয়েছে। তিনটি অ্যান্টি-উপন্যাস(১৯৮২, ১৯৮৪ ও ১৯৯০) রচনার আগে ও পরে ব্র্যাকেট চিহ্নের মতো রয়ে গেছে তাঁর ছোটো উপন্যাস বা নভেলেট দুটি— 'তেজস্ক্রিয় আবর্জনা' (১৯৮০) ও 'আদ্যন্ত মানুষ' (১৯৯২)। নভেলা দুটির তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায় না। কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় বোঝার ক্ষেত্রে এইদুটির গুরুত্ব অপরিহার্য।

'তেজস্ক্রিয় আবর্জনা'-র শুরুতেই যে প্রবল যৌনাচার তুলে ধরেছেন তা বিকৃত ও সামাজিক ভাবে অবৈধ। লোকসমাজের বাইরে অজয় সুষমাদি না ডেকে নাম ধরে ডাকে। কিন্তু অজয়ের সঙ্গে বয়সে বড়ো সুষমার সম্পর্ক কেবলই জৈবিক। অজয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'তিরিশ বছরের তেষট্টি কেজির সুষমা' একজন 'বুড়ী ধুমসী'। মুহূর্তের উত্তেজনা কেটে গেলে তার গা ঘিনঘিন করে, অস্বস্তি হয়। শরীরী লেনদেন মিটে গেলে তারা আবার স্বাভাবিক আচরণে অভ্যস্ত, যেন তাদের মধ্যে কিছুই হয়নি। আদিম প্রবৃত্তিজাত কামনার বাইরে তারা কেউ কাউকে চায় না, ভালোবাসা তো দূরস্থ। কামের মারণ শিকলে বাঁধা অজয় চেতনাহীন নয়। তবুও 'তার পেটে সে বাচ্চা পেড়ে ফেলেছে'। সামাজিকতা এবং নৈতিকতাবোধের দ্বন্দ্বে তার জীবন অতিষ্ঠ। চিন্তাশীল যুবকের মাথায় ঘুরতে থাকে একাধিক অলীক সব ভাবনা। ময়দানে বসে চৌরঙ্গির কাছে অ্যাক্সিডেন্টের খবর পায়, ভাবে এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কত অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে চলেছে। মেয়েটি প্রস্তাব দেয়—

> "আমরা এই সব ঝামেলা ঝঞ্ঝাট থেকে আলাদা থাকব;"[৬]

ছেলেটিও সেই প্রস্তাব লুফে নিয়ে নিজেদের চারপাশে ইঁট সাজাতে লাগলো। লেখক অজয় ও সুষমা চরিত্রের ভাবনাগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর দুই শ্রেণির মানুষের পরিচয় তুলে ধরেছেন একই সঙ্গে। একদল একেবারেই পলায়ণবাদী ও স্বার্থপর, আরেকদল চিন্তাচেতনা থাকা সত্ত্বেও অন্যের দ্বারা পরিচালিত মেরুদণ্ডহীন। এরই মাঝে লেখক

বিক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন ইথিওপিয়ার রূপকথা। দৈত্য থেকে মানুষে উত্তরণের চমৎকার গল্প এবং মানুষ হয়েই প্রথম বিয়ে করার কথা ভাবার মধ্যদিয়ে একটি সূক্ষ্ম বিদ্রুপ রেখে গেছেন। প্রসঙ্গক্রমে লেখক কেঁচোর জননরীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> "যে কেঁচোগুলো পুরুষ, তারাই স্ত্রী অর্থাৎ একই কেঁচোর দেহের ভেতর পুরুষ এবং স্ত্রী দুটো জাতেরই জনন-যন্ত্রপাতি থাকে।"[৭]

উভয়লিঙ্গ কেঁচোর সংগমের বিবরণ দিয়ে যেন মানুষ প্রজাতির প্রাণীকেও লেখক একই শ্রেণিভুক্ত করেছেন, অন্তত সম্ভোগ চেতনার নিরিখে। মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি যেমন যৌনতাকে কেন্দ্র করে, তেমনি আরেকটি হল যুদ্ধ বা ক্ষমতা স্থাপনের লড়াই। তাই গলির মোড় থেকে শুরু করে বিশ্বের রাজপথে বোমা-বারুদের বিষাক্ত ধোঁয়া, গুলি-কামানের তীব্র শব্দ, ছিন্নভিন্ন সৈনিকের রক্তাক্ত দেহ। মার্কিন সেনারা ১৯৬৭-৬৮ সালে ভিয়েতনামীদের ওপর যে নৃশংস হত্যালীলা চালিয়েছিল তার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন কাতাসুইচি হোন্ডা নামে এক জাপানী ক্যামেরাম্যানের লিখিত বর্ণনার পাতা থেকে। আলোর গতিবেগে যুদ্ধের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে—

> "ভিয়েতনাম থেকে রক্ত ছিটকে এল কলকাতায়,"[৮]

কলকাতার বুকেও শুরু হয়েছে অভ্যুত্থান, দলে দলে লোক স্লোগান দিতে দিতে চলেছে। আর সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা উপযুক্ত চিন্তাভাবনা করে মুখে কুলুপ এঁটেছে। তথাকথিত সভ্য-ভব্য সমাজের পাশাপাশি তিনি মধ্য আফ্রিকার নিগ্রো জাতির আচরণ ও লোকসংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন স্যার এইচ এইচ জনসন-এর 'ব্রিটিশ সেন্ট্রাল আফ্রিকা' গ্রন্থ থেকে। এই উলঙ্গ দেশের লোকেরা খুব কমই অশ্লীল দেহভঙ্গি করে বা লাম্পট্যপ্রিয় হয়। তাদের লোকনৃত্যগুলো আশ্লীল মনে হলেও তারা "অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা অনেক-বেশি প্রকৃত লজ্জাশীল এবং অনেক-বেশি প্রকৃত পাপ থেকে মুক্ত।"[৯]

তারা মৈথুনব্যাপারে অনেক বেশি সচ্চরিত্র ও নিয়মানুবর্তী। লেখক এখানে স্পষ্টতই জানিয়েছেন স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে গোপন করতে গেলেই যত কৌতূহল, সেখান থেকেই চারিত্রিক অবক্ষয়ের সূত্রপাত। বিক্ষিপ্ত কাহিনির কোলাজ করতে গিয়ে সুবিমল মিশ্র ডুব দিয়েছেন জীবনবিজ্ঞানের পাতায়। একেবারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আণুবীক্ষণিক যন্ত্রে মানব দেহের বিশ্লেষণ করে জিনের উৎস সন্ধান করেছে চিন্তাশীল অকর্মন্য অজয়। আকাশ পাতাল ভেবে সিদ্ধান্তে এসেছে—

> "এই শরীর, যার প্রতি এই গদগদ ভালবাসা, তা ১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০টি কোষের সমষ্টি মাত্র।"[১০]

স্থূল ভাবে দেখলে যে নারীমাংসের প্রতি লালসা জাগে সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সঙ্গে তার কোন পার্থক্য নেই। গবেষণাগারে ডি.এন.এ, আর.এন.এ, প্রোটিন প্রভৃতি রাসায়নিক মৌলের মিশ্রনে কীভাবে টেস্টটিউব বেবি অর্থাৎ কৃত্রিম মানুষ উৎপাদন করা হচ্ছে সেদিকেও লেখক আলোকপাত করেছেন। মানুষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম মানুষ তো তৈরি করছে, কিন্তু অক্সিজেন? অক্সিজেন ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। প্রাণীকুল এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়তে চলেছে। সমুদ্রের তলদেশে যে শ্যাওলা-পুঞ্জ থাকে তারাই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলে ৭০ ভাগের বেশি অক্সিজেন সরবরাহ করে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রদানবের অত্যাচারে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের বেশি বিষময় পদার্থ এবং পেস্টিসাইড, রেডিও-আইসোটোপ এনজাইম ইত্যাদি সমুদ্রের জলে ফেলা হয়। জাহাজ ইত্যাদি জলযান থেকে প্রায় পনের লক্ষ টন তেল সমুদ্রে মেশে। যার ফলে সামুদ্রিক শ্যাওলার প্রাণনাশ হয়, অক্সিজেনের উৎস বিপর্যস্ত হয়। বায়ুমণ্ডলে কী হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে তার একটি তথ্যের বিবরণ লেখক দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আজীবন অক্সিজেনের উৎস সন্ধানী বিজ্ঞানী অধ্যাপক লয়েড-এর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন— আকস্মিক ভাবে একসময় অক্সিজেনের অভাবে সাংঘাতিক সংকট তৈরি হবে, পৃথিবীর মানুষ খুব দ্রুত সেই দিকেই এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধ যে কতটা নিষ্ঠুর তা আমরা ইতিহাসের

পাতায় দেখেছি। গা ছমছমে ভুতুরে আবহ নির্মান করে লেখক আমাদের ঘুরিয়ে এনেছেন প্রাচীন সভ্যতার শহর মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়। আধুনিক মানবজাতিকে সেই ধ্বংসের পথ থেকে সরে আসার সতর্কতাবাণীই লেখক দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের নাম ও তাদের বিষক্রিয়ার পদ্ধতি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন মানবজাতি কীভাবে যুগের পর যুগ জিনের মধ্য দিয়ে বহন করে। ট্রন্সিয়াম[৯০], আয়োডিন[১৩১], সিজিয়াম[১৩৭], বেরিয়াম[১৪০] ইত্যাদির মানবদেহে রেডিও নিউক্লাইডস-এর সঞ্চার পথের সচিত্র ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

নভেলাটি শেষ পর্যন্ত পাঠককে কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি এনে ফেলে— উক্ত তেজস্ক্রিয় আবর্জনাগুলির আবিষ্কারক কারা? কারাই বা এগুলির প্রয়োগকর্তা? কাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহৃত হয়? সব প্রশ্নের একটাই উত্তর, মানুষ। মানুষের জিনের মধ্যে যে আদিম লোভ-লালসা, জান্তব হিংস্রতা, যুদ্ধ প্রবণতা মিশে রয়েছে সেগুলি এবং আধুনিককালের তেজস্ক্রিয় বর্জ্য সমার্থক। মনুষ্যজাতির অনিয়ন্ত্রিত লোভ সমাজের যেমন ভারসাম্য নষ্ট করছে তেমনই প্রকৃতিরও ক্ষতি করছে। তাই সবচেয়ে বড়ো এবং ক্ষতিকর তেজস্ক্রিয় আবর্জনা মানুষ— যারা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বংশগতির মধ্য দিয়ে আদিম চেতনা বহন করছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত করে যাবে। এই ভাব পাঠককে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পের কথা স্মরণ করায়।

প্রথমেই জেনে রাখা ভালো ‘আদ্যন্ত মানুষ’-এ নির্দিষ্ট কোনো কাহিনিসূত্র খুঁজতে যাওয়া বোকামি। টুকরো টুকরো ঘটনার কাটিং, বিভিন্ন বই থেকে সংগ্রহ করা কিছু উদ্ধৃতি, আর তার প্রেক্ষিতে লেখকের নিজস্ব অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সাজানো এই নভেলাটি। প্রথমেই দেখা যায় নামহীন কথক অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অসম্পূর্ণভাবে। বিছানায় একটা বিশ্রি দাগ, কীসের বোঝা যায় না। স্ত্রী লীলার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা চলে, কথাবার্তা হয় ‘সেক্স-এর স্বাধীনতা’ নিয়েও। প্রসঙ্গান্তর ঘটে— জমিদার বাড়ির ছোটো ছেলের কথা আসে। সে শুধু কাটিং জমিয়ে যাচ্ছে— ডায়েরির কাটিং, চিন্তার কাটিং, গল্পের কাটিং ইত্যাদি। সবকিছু জোড়াতালি দিয়ে সে সামাজিকতা অনুসন্ধান করে। পরিবারের মধ্যে থেকেও সে পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে নভেলার কথক, জমিদারের ছোটো ছেলে এবং লেখক নিজে যেন একই চিন্তাধারায় অবগাহন করেছেন। তিনি দলে টেনেছেন কাফকা, মানিক, জগদীশ-কে—

> “কাফকারও কেউ ছিল না বোধ হয়, মানিকেরও। জগদীশ গুপ্ত-র কেউ ছিল কি?”[১১]

মার্কেস অর্থাৎ যাকে ম্যাজিক রিয়ালিসমের প্রাণপুরুষ বলা হয় সেই গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেস-এর ‘একশ বছরের নির্জনতা’ (১৯৬৭)-র প্রসঙ্গ এনে বুঝিয়ে দিয়েছেন বই কেবল বুদ্ধিজীবীদের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকও তা থেকে সাহিত্যরস আস্বাদন করতে পারে। বই আসলে জীবনেরই কথা বলে। কাহিনির মাঝে এসেছে পুরীর সমুদ্র সৈকত, রেখা নামের এক মোহময়ী নারীর সঙ্গ লাভ। ফ্ল্যাশব্যাকে ধরা পড়েছে এক ঝড়বৃষ্টির রাতের নাটকীয় দৃশ্য। কথক হলুদরঙা ফ্রক পরা কিশোরীর সঙ্গে অশ্লীল কথোপকথনের মধ্য দিয়ে প্রণয়ালাপের ও সংগমের স্মৃতিচারণ করেছে। মেয়েটির নাম ময়না, সরস্বতী বা লক্ষ্মী যাহোক কিছু হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বারবার কাফকার ‘দ্যা ক্যাসল’ উপন্যাসের কে. এবং ফ্রাইডার গোপন অভিসারের গোপন রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। যৌনতাকে অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে যে কোনোভাবেই জীবন থেকে কিংবা সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া যায় না, ঘুরে ফিরে লেখক এই সত্যেই উপনীত হয়েছেন। কাফকার লেখার মধ্যে সেক্স-এর প্রয়োগ খুব সাবলীল ভাবেই দেখা যায়। কাফকা নিজেও তাঁর ডায়েরিতে অবলীলায় স্বীকার করেছেন তিনি একেবারে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ্যাবাড়ি যেতেন। কিন্তু—

> “১৯১০ সালে লেখা ডায়েরির এইসব অংশ ম্যাক্স ব্রড কেটে উড়িয়ে দিয়ে কাফকাকে সন্ত বানিয়ে ছেড়েছেন, গুডবয়, আর ডায়েরিতে লেখা মেয়েছেলেদের কথাই শুধু নয় যৌনতা-সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত ঘটনাই ধুয়ে-মুছে সাফ করে নুনুতে সেন্টু লাগিয়ে দিয়েছেন।”[১২]

কোনো লেখকের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অশ্লীলতার দায়ে বিকৃত করার এই ঘটনাকে সুবিমল মিশ্র সুতীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্রুপ করেছেন এবং এর চরম বিরোধিতা করেছেন ঠোঁট কাটা শব্দচয়নে। সাহিত্যের পাতায় যে বিবরণ অশ্লীল বলে মনে হয়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাস্তব সমাজে সেই ঘটনা দেখেও মানুষ চোখে ঠুলি পড়ে থাকে। কলকাতা শহরের বুকে প্রকাশ্যে বেশ্যাবৃত্তি চলে। আট থেকে আশির দেহপসারিণীদের গ্রাহক ফুটপাতের মাতাল থেকে কলেজে পড়ানো বছর পঁয়তাল্লিশের প্রফেসর— পুরুষজাতি এই একটি জায়গায় সবাই একই শ্রেণির। এখানে রুচির কোনো বাছ-বিচার থাকে না। আধুনিক কালে কামাতুরদের সেবার জন্য কেবল পতিতালয় নয়, পরিষেবা দেবার বহুবিধ ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবসায় নতুনত্ব আনতে এ্যালবাম দেখিয়ে মেয়ে বুক করা থেকে শুরু করে জোড়ায় জোড়ায় বাসে করে ভ্রমণের সুযোগ দিচ্ছে কলকাতার কিছু ট্রাভেল এজেন্সি। কিংবা দালাল একদম 'ফিরেস মাল' ধরিয়ে দেবে শিয়ালদার বাজার থেকে। হাসপাতালের পিছনে ঝুপড়ি রেডি। তার জন্য পুলিশদের 'দশ টাকা করি দিতি হয়'। এইসব অষ্টাদশী 'ফিরেশ মাল'দের স্বামী, পরিবার সবাই সব জানে— যে ভাত যোগায়, তাড়ি গেলার টাকা জোগায় সে তো স্বয়ং অন্নপূর্ণা। এই ঘটনার সূত্র ধরে সার্ত্র-এর 'Being and Nothingness' গ্রন্থের কথা এসেছে। এসেছে বুর্জোয়া ব্যবস্থায় ব্যক্তির চরম বিকৃতির কথা—

> "ব্যক্তি থেকে আসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, তার থেকে ধীরে ধীরে, প্রায় অজান্তেই জন্ম নেয় ব্যক্তি-সর্বস্বতা— যার নিদর্শন এই সমাজব্যবস্থা।"[১৩]

সেই বিকৃতি এমন স্তরে পৌঁছে গেছে যেখানে মা বাবা বৌ ছেলেমেয়ে সবাই মিলে একসঙ্গে ব্লু ফিল্ম করছে, এটাকেই তারা প্রফেসান হিসাবে নিয়েছে। কলকাতায় বাইরের রাজ্য থেকে কাজ করতে আসা শ্রমিকদের বেওয়ারিশ লাশ নিয়েও হাসপাতালের কর্মীরা ব্যবসা করছে—

> "কলকাতা শহরে হরেক রকমের পেশা। বডিস্মাগলিংও একটা পেশায় পরিণত হচ্ছে ক্রমশ।"[১৪]

সাংবাদিকতার পেশাও যে কতটা নিচে নেমে গেছে তারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পরিচিত মুখ বিজয়া সাক্ষাৎকার দিতে আপত্তি করলে সাংবাদিক তার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন কথা কাগজে ছাপিয়ে দেওয়ার কথা বলে ব্ল্যাকমেইল করে। তার স্বামী সমীরের সম্পর্ক সেই পূর্বোক্ত রেখার সঙ্গে। সমীর রেখাকে দিয়েও দেহব্যবসা কয়ায়। বিজয়া-সমীর-রেখা-কথকের মধ্যে এমন এক জটিল সম্পর্কের জাল তৈরি হয়েছে যেখান থেকে কেউ বেরতে পারছে না। নারীর যন্ত্রণা, মনুষ্যত্ববোধের পাশাপাশি অস্তিত্ব বিপন্নতার দিকটিও ফুটে উঠেছে। সত্যিকারের বিবেকসম্পন্ন মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বিলুপ্তির পথে গেলেও সম্পূর্ণরূপে পারছে না, বিবেকের বিন্দু মাত্র কাঁটা যেন পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুলছে। কিছু মানুষ নিজেদের খুব ইনটেলেকচুয়্যাল, স্বতন্ত্র ভাবে। কিন্তু এই অবক্ষয়ী ঘোলাটে অন্ধকার আবহাওয়ায় মানুষ নিজস্বতা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। আর যারা সত্যি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে তাদের সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে সমাজের কোনো সম্পর্ক নেই। থাকলেও তা প্রয়োজনের বাইরে নয়। তাদের কপালে জোটে 'অসামাজিক' তকমা। অতিসামাজিক হতে গিয়ে সবাই এক ছাঁচে ঢালা একরকম চিন্তাভাবনার রক্ত-মাংসের পুতুলে পরিণত হচ্ছে। তাই কাহিনির কথক আর সমীরের মধ্যে চিন্তাচেতনা, আচরণ কিংবা আদর্শগত কোন পার্থক্য থাকে না। তবে আত্মদর্শনের প্রচেষ্টা কথকের মধ্যে আছে। লেখক আরও দেখিয়েছেন আত্মঅনুসন্ধানের কোনো বয়স হয় না। চৌষট্টি বছরের ভদ্রমহিলা ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি হয় আত্মরক্ষার জন্য। তার এই উদ্যোগে প্রথম বাধা আসে তারই শিক্ষিত আধুনিকা মেয়ে, পুত্রবধু ও পরিবারের থেকে। চেংরা ছেলেপুলের দল মা-মাসি, দিদিমা-ঠাকুমার বয়সী মহিলাদের সঙ্গেও বাসে ট্রেনে অসভ্যতা করে। সমাজের এই নৈতিক পতন সত্যিই লজ্জাকর। মহিলাদের স্বনির্ভর ও আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়ে ওঠার বিষয়ে লেখক বিশেষ করে জোর দিয়েছেন। কলিযুগে দুর্যোধন, দুঃশাসন রাস্তার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেরায়, ক্ষমতাতন্ত্রের শীর্ষে বসে থাকে; তাই এযুগের দ্রৌপদীদের কৃষ্ণের ভরসায় থাকলে হবে না, শিখতে হবে ব্রুশলির ক্যারাটে শট। বিবাহ ও পরকিয়ার মধ্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের প্রসঙ্গে বারট্রান্ড রাসেল-এর 'ম্যারেজ অ্যান্ড মর‍্যালস' গ্রন্থের কথা এসেছে। রাসেলের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাও ব্যক্ত হয়েছে। 'আদ্যন্ত মানুষ'-এ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষের মান ও হুঁশ কীভাবে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। সৎ বোধ, বুদ্ধি, বিবেক লুপ্ত হয়ে মানুষ বর্তমানে কেবলই হোমো স্যাপিয়েন্স, পৃথিবীর সর্ব শ্রেষ্ঠ জীব।

বইপোকা সুবিমল মিশ্রের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য একাধিক লেখকের লেখার নির্যাস দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করা। তিনি নিজেই সে কথা স্বীকার করেছেন—

> "আমি ক্ষেত্রবিশেষে লিখি না। কোলাজ
> করি। কাট্ করি। যে ভাবে ক্যামেরা
> অবস্থিত বস্তুকে করে। বস্তু
> আগের থেকে অবস্থিত থাকে। ক্যামেরা
> তাকে বের করে আনে। অবস্থান বিন্দু থেকে।
> বিশিষ্টতা দেয়। সৃষ্টি করে।
> আমিও লেখা প্রস্তুত করি। ক্যামেরার
> ধরার ধরনে করি। লেখা থেকে
> কাট্ করি। সৃষ্টি
> করি। যা ছিল তা থেকে এক নতুন।
> নতুন ধরনের সৃষ্টি। নতুন
> উপস্থাপনা। নতুন
> দৃষ্টিকোণ। নতুন
> মাত্রা।
> বিশ্লেষণ সবকিছুর নাগাল পায় না।
> গোদারা একে মারা বলে।"[১৫]

(সুবিমলের পরিচয় দিচ্ছে সুবিমল/ ৯)

ভাষা প্রয়োগ ও শৈলী নির্মাণে তিনি এক সুদক্ষ শিল্পী। কয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে—

- বিশেষণ ব্যবহারে তিনি চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন। যেমন— 'তিরিশ বছরের তেষট্টি কেজির সুষমা', 'পিতামহের দীর্ঘ দাড়িওলা ছবি', 'খর রোদের দুপুর', 'লাল টকটকে রেশমি শায়া', 'জ্বলন্ত ময়দানে', 'সুষমাকে, এই বুড়ী ধুমসীকে', 'নেড়া পার্কে', 'বুড়ো চাঁদ', 'সুষমা ঝিলিক ঝিলিক হাসে', 'নয় সন্তানের জননী পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স্কা মাদাম-দ্য-বার্নি' প্রভৃতি।
- লেখক প্রচলিত বানানকে ভেঙে দিয়ে বানান নিয়েও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। উচ্চারণ অনুযায়ী বানান তৈরি করে নিয়েছেন। তবে বানানের তারতম্যে অর্থ বিপর্যয় ঘটেনি। যেমন— কাংখিত, সুরু, চৌরংগি, ইংগিত, রংগ, পূর্ণাংগ, সংগে, আংগিক, তরংগ, অমংগলবোধ প্রভৃতি।
- ব্যতিক্রমী শব্দবন্ধ তৈরিতে তিনি ওস্তাদ। যেমন— খুচরো আওয়াজ, জনন-যন্ত্রপাতি, মুরগিগুলো ...ওমলেট পেড়ে যাচ্ছে, সমাজের উপদংশসর্বস্ব ঘা, অসম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য প্রভৃতি।
- অনুকার শব্দ— নেড়েচেড়ে, আকুলি-বিকুলি, লুটোপুটি, খরচাপাতি, কান্নাকাটি, এক-আধটু, ঢিলেঢালা প্রভৃতি।
- ধ্বন্যাত্মক শব্দ— কড়কড় মেঘের ডাক, হৈ চৈ, ঢং ঢং, সোঁ সোঁ শব্দ, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদা প্রভৃতি।
- গালাগালের ভাষাও রয়েছে— কথক বলছে 'শাল্লা', সেই হলুদরঙা ফ্রক পরা কিশোরী মেয়ের মুখে শোনা যায় 'বাঁশবুকো—ছুঁচো—লাফাংগা'। পতিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে মাগী, খানকি প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার রয়েছে।
- অলংকারের ব্যবহার ভাষায় মাধুর্য সৃষ্টি করেছে। অন্যান্য অলংকারের ব্যবহার থাকলেও উপমা অলংকারের প্রয়োগ বেশি লক্ষ করা যায়। যেমন—
  'সুষমা হাত দিয়ে দিয়ে তারিফ করছে অথচ পেটুক জন্তুর মতো চিৎ সে,' (পৃ ৩৪৫),
  'গর্ভিনী গাভীর মতো শ্বাসকষ্ট পাচ্ছিল এখন তেষট্টি কেজির সুষমা' (পৃ ৩৪৫)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'...সুন্দরী এক মেয়ে, মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মতো রূপ-লাবন্য নিয়ে।' (পৃ ৩৪৬)
'স্টার্টদেওয়া গাড়ির বনেটের মতো আঙুলগুলো কাঁপছিল।' (পৃ ৩৭০),
'গিনিপিগের গায়ের মতো তুলতুলে।' (পৃ ৩৭১)

এছাড়াও অতিদীর্ঘবাক্য ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে। কোনো বিরাম চিহ্ন নেই এমন বাক্যও রয়েছে। পূর্ণচ্ছেদ ছাড়াই প্রসঙ্গান্তর ঘটেছে প্রায়ই। চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ সংলাপ প্রয়োগে লেখা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনে অশ্লীল শব্দও নির্দ্বিধায় সাবলীলভাবেই চরিত্রের মুখে প্রতিস্থাপন করেছেন। বাক্যের গঠন কোথাও অতীব সরল, আবার কোথাও খুবই জটিল। তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য দ্বান্দ্বিকতা, যা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও রয়েছে। লেখক টুকরো টুকরো কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মানিক, কমলকুমার কিংবা জগদীশ গুপ্তের ভাষা নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন। তাঁদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছেন খানিকটা। যুগের তালে তাল মিলিয়ে বিবর্তিত হয়েছে তাঁর ভাষা। সুবিমল মিশ্রের রচনা শৈলী এতটাই স্বতন্ত্র ও বৈচিত্র্যময় যে কেবল সেটি নিয়েই একটি পূর্নাঙ্গ গবেষণাপত্র হতে পারে। এখানে যৎসামান্য নমুনাই দেওয়া গেল। আশা রাখি উৎসাহী পাঠক সুবিমল মিশ্রের অন্যান্য লেখা পাঠ করবেন।

কোনো কোনো সমালোচক বলেন সুবিমল মিশ্র হরফ ছোটো-বড়ো, সরু-মোটা করে তাতে ভরপুর রগরগে যৌনতার মশলাপাতি মিশিয়ে যা রচনা করেন তা পর্ণোগ্রাফি ছাড়া কিছু নয়। অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ বাহুল্যে তাঁর লেখা অপাঠ্য, একই সঙ্গে কুপাঠ্য। শ্লীল-অশ্লীলের মানদণ্ড নির্ধারণ করবে কারা? সাহিত্যের শর্ত আর সমাজের শর্ত যে একেবারেই পৃথক। সমাজে নিয়ম ভাঙা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত; আর সাহিত্যে পুরনো ধাঁচের বর্ম ভেদ করে এগিয়ে চলাই সৃষ্টি। স্রষ্টা কখনো বাধা মানেন না। শ্লীল-অশ্লীলের ভেদাভেদ তাঁর কাছে মিথ্যা, একমাত্র সত্য জীবন—

"গল্পকার গল্প জানে না, জীবন জানে, আর জীবন গল্পের চেয়েও অশ্লীল।"[১৬]

বিষয় ভাবনা ও গঠন কৌশলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা থাকলেও তাঁর লেখা যৌনতা ও রাজনীতির মোরকে এক শুভ চেতনার জাগরণ ঘটায়। লেখক মনে করেন একটা 'প্ল্যান্ড ভায়লেন্স' প্রকৃত হিংস্রতাকে প্রশমিত করতে পারে। হাজার রকম ভণ্ডামির বিরোধিতা করতে গিয়ে বেছে নিয়েছেন একাধিক ফর্ম। পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি বা তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রুতিকটু ও দৃষ্টিকটু শব্দ ও বিষয়গুলিকে বাদ দিয়ে, লঘুবিনোদন না খুঁজে তাঁর লেখা পাঠ করলে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা যায়— অস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানচেতনা, নরনারীর প্রকৃত সম্পর্ক, প্রকৃতিপ্রেম, সচেতন নাগরিকের কর্তব্যবোধ, বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে দূরদর্শিতা প্রভৃতি। সামাজিক দায়বদ্ধতা ঝেড়েফেলা শিক্ষিত ডিগ্রিধারী সমাজের জন্য একপ্রকার উন্নতমানের জঞ্জাল। বর্তমানকালের যুদ্ধবিধ্বসস্ত খুন-রাহাজানির পৃথিবীতে সাহিত্য শুধু অবসর সময়ে বিনোদনের উপাদান নয়, প্রতিবাদের মাধ্যমও বটে। নির্মল আনন্দ লাভের পাশাপাশি সময়োপযোগী সাহিত্যও পাঠ করা জরুরি— সুবিমল মিশ্রের দৃঢ় কলম আমৃত্যু সেই খোরাক জুগিয়ে গেছে। প্রিয় পাঠক-বন্ধুগণ, সংরক্ষণশীল মানসিকতার বর্ম ফেলে মানবতার স্বার্থে আজ থেকেই তবে শুরু হোক সুবিমল চর্চা— প্রতিষ্ঠান বিরোধী সাহিত্য চর্চা। সাবধান! প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার প্রতিষ্ঠান যেন তৈরি না হয়।

Reference:

১. মিশ্র, সুবিমল, 'আত্মজীবনীর খসড়া', বাঘের বাচ্চা, সুবিমল মিশ্র সংখ্যা, বাঘের বাচ্চা ১, বইমেলা ২০১৫, পৃ. ৯
২. ঐ, পৃ. ৯
৩. ঐ, পৃ. ১১
৪. ঐ, পৃ. ১১
৫. আলম, মারুফুল, 'প্রসঙ্গ সুবিমল মিশ্র এবং তদ্বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত রিপোতার্জ', বাঘের বাচ্চা, সুবিমল মিশ্র সংখ্যা, বাঘের বাচ্চা ১, বইমেলা ২০১৫: পৃ. ২৮৭
৬. মিশ্র, সুবিমল, 'বই সংগ্রহ-২', দ্বিতীয় মুদ্রণ, গাঙচিল, নভেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৩৪৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 244 - 253
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৭. ঐ, পৃ. ৩৪৭
৮. ঐ, পৃ. ৩৫০
৯. ঐ, পৃ. ৩৫২
১০. ঐ, পৃ. ৩৫৫
১১. ঐ, পৃ. ৩৬৮
১২. ঐ, পৃ. ৩৭২
১৩. ঐ, পৃ. ৩৭৭
১৪. ঐ, পৃ. ৩৮২
১৫. হুদা পথিক, কামরুল, 'সুবিমল মিশ্র'র মৃত্যুর ২ যুগ পর সুবিমল মিশ্রকে খুঁজে পাওয়া গেলো তাঁরই প্রতিপক্ষদের ডুগডুগির মেলায়', বাঘের বাচ্চা, সুবিমল মিশ্র সংখ্যা, বাঘের বাচ্চা ১, বইমেলা ২০১৫: পৃ. ২৭১ - ২৭২
১৬. ঐ, পৃ ২৭০

Bibliography:

আকর গ্রন্থ:

মিশ্র, সুবিমল, 'বই সংগ্রহ-২', গাঙচিল, নভেম্বর ২০১৮

সহায়ক পত্রিকা:

হালদার, স্বপন রঞ্জন, 'বাঘের বাচ্চা', বইমেলা ২০১৫